গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যা | ১৫ - ২১ নভেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকীতে দলের শিবপুর সেন্টারে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

ভেতরের পাতায়

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের অর্জিত সাফল্যকে হারিয়ে যেতে দেওয়া চলে না। ● পৃঃ ৩

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন। ● পৃঃ ৭

কোচবিহারে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে

সার আন্দোলনে চাষিদের জয়

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-১ নং ব্লকে চাষিরা সারের কালোবাজারি রুখে দিলেন। শাসক দলের প্রশ্রয়ে দীর্ঘদিন ধরে রমরমিয়ে চলছিল রাসায়নিক সারের কালোবাজারি। প্রশাসনের নানা স্তরে আগেই অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর (এআইকেকেএমএস) সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও কালোবাজারি চলছিল। এই মরশুমে চাষের জন্য মিশ্র সার ১০:২৬:২৬ খুবই প্রয়োজনীয়, যার ৫০ কেজি বস্তার এমআরপি রেট ১৪৭০ টাকা। কিন্তু ক্যাশ মেমো ছাড়াই দোকানদার চাষিদের কাছে এই সার বস্তাপিছু ৫০০ টাকা বেশি দামে বিক্রি করছিল।

এই পরিস্থিতিতে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে চাষিদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ শুরু হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সান্ত্বনা দত্ত ও ব্লক সম্পাদক রমাকান্ত রায়। আন্দোলনের চাপে মহকুমা কৃষি আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ব্যবসায়ীরা চাষিদের প্রয়োজনীয় সার দিতে বাধ্য হয়।

আন্দোলনের জয়ের খবর জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি হয়। সার কেনার সময় ট্যাগিং সমস্যাও ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার চাষিরা কিনতে গেলে ব্যবসায়ীরা এর সাথে চড়া দামের অণুখাদ্য সার নিতে বাধ্য করছিল। অথচ তা চাষিদের কোনও কাজে লাগে না। বছরের পর বছর রাসায়নিক সারের এই কালোবাজারি ও বেআইনি ট্যাগিং সিস্টেম সরকার ও প্রশাসনের নাকের ডগাতেই চলেছে। যে সব ব্লকে এআইকেকেএমএস প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে সেখানে এটা বন্ধ করা যাচ্ছে। বাস্তবে সার ব্যবসায়ী, প্রশাসন ও সরকার এই তিনের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক অশুভ চক্র। বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি চাষের উপকরণের দামও লাগামহীনভাবে বাড়ছে, সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এর বিরুদ্ধে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে আন্দোলন দিনে দিনে গতি পাচ্ছে।

আর জি কর আন্দোলনের লক্ষ্য ন্যায়বিচারের সাথে স্বাস্থ্যের হাল ফেরানোও

কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের ভিতরেই সেখানকার চিকিৎসক-ছাত্রী 'অভয়া'র নারকীয় হত্যার ভয়াবহ ঘটনার তিন মাস পার হয়ে গেল। ন্যায়বিচার মেলা দূরের কথা, এখনও খুনিদেরই চিহ্নিত করতে পারল না সিবিআই। ব্যতিক্রমী হওয়া সত্ত্বেও শিয়ালদহ আদালতে আর পাঁচটা মামলার মতোই গয়ংগচ্ছ ভাবে চলছে অভয়া মামলার কাজ। সুপ্রিম কোর্ট স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে এই মামলা হাতে তুলে নেওয়ায় দ্রুত ন্যায়বিচার মিলবে ভেবে আশান্বিত হয়েছিলেন যাঁরা, আদালতের রকমসকম দেখে হতাশ হওয়া ছাড়া তাঁদের উপায় থাকছে না। কোর্টে তারিখের পর তারিখ দেওয়া হচ্ছে, আর ন্যায়বিচারও যেন দিনে দিনে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

হাসপাতালের ভিতরের একটি ঘরে অভয়ার মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর জি করে তাঁর সহকর্মী জুনিয়র ডাক্তাররা আঁচ করেন যে, কর্তৃপক্ষ যেভাবে এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তা আসলে এক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডকে আড়াল করার চেষ্টা। তাঁরা আরও বুঝতে পারেন যে, রাজ্যের গোটা স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও মেডিকেল কলেজগুলি জুড়ে যে ভয়ঙ্কর চুরি-দুর্নীতি ও হুমকি-সংস্কৃতি চলছে, এই হত্যাকাণ্ড সে সবের পিছনে থাকা শাসকদল-পোষিত নানা বিষচক্রের কুকীর্তিরই পরিণাম। ফলে সেই মুহূর্তেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন শুরু করেন। যোগ দেন অন্য মেডিকেল কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন চিকিৎসকরা। কর্মবিরতিতে যান জুনিয়র ডাক্তাররা। অভয়া হত্যার প্রতিবাদে গোটা রাজ্যে আন্দোলনের ঝড় ওঠে। সে ঝড় ছড়িয়ে পড়ে গোটা দেশে তো বটেই, এমনকি দেশের বাইরেও।

চারের পাতায় দেখুন

বিচারহীনতার ৯০ দিনে ডব্লিউবিজেডিএফ-এর ডাকে কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড মিছিল। ৯ নভেম্বর

ধনকুবেরদেরই বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ট্রাম্প

আমেরিকার জনগণের আশা করার কিছু নেই

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ী হওয়ার ঘটনায় অনেকেই অবাক হয়েছেন। ফলাফলের পূর্বাভাসে 'বিশেষজ্ঞ'রা খুব বেশি হলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছিলেন, এমন সাইক্লোনিক জয়ের কথা অনেকেই ভাবতে পারেননি। অথচ মার্কিন সমাজ জুড়ে তার লক্ষণ স্পষ্ট ছিল। মানুষের প্রতিক্রিয়াও ছিল দ্ব্যর্থহীন। অনেকেই তা পড়তে চাননি। মনকে চোখ ঠেরেছেন তাঁরা।

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বে জর্জরিত মার্কিন জনগণ। আর্থিক বৈষম্য বেড়েই চলেছে। কোভিড অতিমারির ভয়ঙ্কর আক্রমণে বিধ্বস্ত অর্থনীতির বিরাট বোঝা চেপে বসেছে জনগণের ঘাড়ে। মানুষ মুক্তি চাইছে এ সব কিছুর থেকে। কে দেবে মুক্তি! প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমলেই তো এই বোঝা চেপেছে তাদের ঘাড়ে। ত্রাতা সেজে আবির্ভূত হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বললেন, বাইডেন সরকারই তোমাদের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। আমাকে জেতাও, আমি তোমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেব। মানুষ ভুলে গেল আগের বারের ট্রাম্প-শাসনে তাদের দুর্দশার কথা।

প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি

ট্রাম্প বললেন, তোমাদের বেকারত্বের জন্য দায়ী অভিবাসীরা। অবৈধ অভিবাসীদের আমি ঘাড়ধাক্কা দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেব। খুশি হল দেশের বিরাট বেকার বাহিনী, কাজ হারানোর আতঙ্কে আড়ষ্ট শ্রমিকরা। তিনি বললেন, আমেরিকা আমেরিকানদের জন্য। খুশি হল গ্রামের শ্বেতাঙ্গ কৃষকরা, শহরের শ্রমিকরা— যারা তাদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য অভিসম্পাত দেয় অশ্বেতাঙ্গদের, মনে করে আমেরিকা দেশটা আসলে তাদেরই। ট্রাম্প বললেন, আপনারা ট্যাক্স দেন, আর সেই ডলার দেশের

দুয়ের পাতায় দেখুন

ধনকুবেরদেরই বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ট্রাম্প

একের পাতার পর

উন্নয়নের কাজে না লাগিয়ে বাইডেন সরকার ঢালে ইউক্রেন, ইজরায়েলে যুদ্ধের পিছনে। আমি ক্ষমতায় এলে যুদ্ধ বন্ধ করব। আমার সরকার যুদ্ধের পিছনে টাকা ঢালা বন্ধ করবে। খুশি হল দেশের মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষ। খুশি হল প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের একতরফা আক্রমণে নিহত হাজার হাজার প্যালেস্টিনীয় মানুষের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মুসলিম এবং গণতান্ত্রিক মনোভাবের মানুষেরা। ট্রাম্প বললেন, তিনি ক্ষমতায় এলে গর্ভপাত নিষিদ্ধ হবে। খুশি রক্ষণশীল খ্রিস্টান সমাজ। ট্রাম্প দেশের মানুষকে বোঝালেন, তাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী বাইডেন সরকারের অর্থনীতি। বললেন, আমাকে ভোট দিলে চড়া আমদানি শুল্ক বসাব। তাতে বিদেশি পণ্য দেশের বাজারে ঢোকা বন্ধ হবে। দেশীয় শিল্প চাঙ্গা হবে। কাজ পাবে দেশের মানুষ। এমন সংখ্যাহীন প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী সভাগুলিতে নির্বিচারে বিলিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তৃতা শুনে খুশি হয়ে ফিরে গেছে সব স্তরের সংকটজর্জরিত মানুষ। ঢেলে ভোট দিয়েছে ট্রাম্পকে।

ট্রাম্পের পাশে মার্কিন ধনকুবেররা

মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আর্থিক বৈষম্য এ বার মার্কিন ভোটারদের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে ছিল। সেগুলিকেই প্রচারে তুরুপের তাস করেছিলেন ট্রাম্প। বাস্তবে ডেমোক্র্যাট দল, নির্বাচনে যার প্রার্থী ছিলেন কমলা হ্যারিস আর রিপাবলিকান দল, যার প্রার্থী ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প— এই দুই দলই মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য স্বার্থরক্ষাকারী দল। তাই মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই দুই দলের নির্বাচনী তহবিলেই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঢেলেছে। কিন্তু সংকটজর্জরিত, ঋণগ্রস্ত, মন্দা-আক্রান্ত মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণির দরকার ছিল একজন 'শক্তিশালী' পুরুষ, যিনি গণতন্ত্রের তোয়াক্কা করেন না, যিনি সংকট জর্জরিত জনতাকে নানা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে মোহগ্রস্ত করতে পারবেন, ধনকুবেরদের দেদার করছাড় আর রাষ্ট্রীয় মদতের স্বর্গরাজ্য গড়ে দেবেন। তাই তাদের মনের মতো প্রার্থী রিপাবলিকান দলের ডোনাল্ড ট্রাম্পই ধনকুবেরদের সমর্থন পেলেন সবচেয়ে বেশি। তেল, ওষুধ এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রের দানবীয় কর্পোরেটেরা দেদার ডলার ঢালতে থাকল ট্রাম্পের প্রচারে। মার্কিন শীর্ষ ধনকুবের, সমাজমাধ্যমের প্ল্যাটফর্ম এক্স এবং টেসলার কর্ণধার ইলন মাস্ক ট্রাম্পের নির্বাচনী ফান্ডে যেমন বিপুল অর্থ ঢেলেছেন তেমনই প্রকাশ্যে ট্রাম্পের হয়ে প্রচারে নেমেছেন। নির্বাচনের ফল না বেরোতেই মাস্কের শেয়ারের দাম এক লাফে ১৪ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। শেয়ারের দাম বেড়েছে আর এক ধনকুবের জেফ বেজোসেরও। অর্থাৎ জনতার জন্য মূল্যবৃদ্ধি রোধ না হলেও, কর্মসংস্থানের কোনও দিশা না পেলেও মার্কিন ধনকুবেরদের সম্পদ এখনই লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। তাই ট্রাম্প যখন নির্বাচনী প্রচারে 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' স্লোগান তুলেছেন, বেকারি, গরিবি, বৈষম্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা না মেলার মতো সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির জন্য কৃষ্ণাঙ্গ ও অভিবাসী মানুষকে দায়ী করে বিজ্ঞানবিরোধী, যুক্তিহীন, দক্ষিণপন্থী, বর্ণবিদ্বেষী আধিপত্যবাদের উস্কানি দিয়ে দেশের শ্বেতাঙ্গ সমাজের বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ ব্যাপক অংশটিকে ক্রমাগত উত্তেজিত করে তুলেছেন সেই কাজে ট্রাম্পকে পুরো মদত দিয়েছে কর্পোরেট পরিচালিত মার্কিন মিডিয়া। সেই প্রচারে ভুলে মানুষ বিশ্বাস করেছে ট্রাম্প মানেই সব সমস্যার সমাধান।

শুধুই মিথ্যাচার

ট্রাম্প কী ভাবে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবেন, কী ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবেন আর কী ভাবেই বা আমেরিকাকে ফের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ করে তুলবেন তার কোনও দিশা তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাগুলির কোথাওই ছিল না। বাস্তবে বীভৎস আর্থিক বৈষম্য, ব্যাপক বেকারি ও চরম গরিবির মতো যে সমস্যাগুলিতে মার্কিন সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে, তার সমাধান বর্তমান মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়, তা সে দেশ যত ধনীই হোক না কেন। পুঁজিবাদের অনিবার্য নিয়মেই এই সব সংকটের জন্ম। পুঁজিবাদের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে পুঁজিবাদকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যে তার সমাধান নেই। পুঁজিবাদের নিয়মেই বাইডেনের শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, ছাঁটাই, দারিদ্র বৃদ্ধি, পুঁজিপতি শ্রেণির বিপুল সম্পদবৃদ্ধি, সমাজ জুড়ে অপরাধের বাড়বাড়ন্ত সব কিছুই সাধারণ মানুষকে বাইডেন শাসনের বিরোধী করে তুলেছে। কিন্তু মূল নীতিগত ক্ষেত্রে যেহেতু বাইডেন শাসনের সাথে ট্রাম্প শাসনের কোনও ফারাক নেই, তাই জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে একই ভাবে ব্যর্থ হবেন ট্রাম্পও। বরং চরম দক্ষিণপন্থী ট্রাম্প-শাসন সেগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং ট্রাম্প সম্পর্কে জনগণের মোহও অতি দ্রুতই ভেঙে পড়বে। কিন্তু জনগণ যদি তাদের দুর্দশার আসল কারণ যে পুঁজিবাদী শোষণ, তার চরিত্র সম্পর্কে সচেতন না হয়, মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ধরতে না পারে, তবে আবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ যখন বাড়তে থাকবে, এই পুঁজিপতিরাই ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে লাগাতার প্রচার দিয়ে দিয়ে মানুষের সামনে তাদের গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। সেই প্রচারে মানুষ আবার ভুলবে। পুঁজিবাদী দেশে দেশে এই জিনিসই চক্রের আকারে ঘটে চলেছে। পুঁজিবাদী সংসদীয় গণতন্ত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য।

শান্তির মিথ্যা আশ্বাস

ট্রাম্প মুখে যতই শান্তির কথা বলুন, বাস্তবে শান্তি আনা তাঁর কর্ম নয়। সংকটগ্রস্ত মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে শান্তি বাস্তবে আত্মহত্যা। কারণ অস্ত্রের উৎপাদন এবং তার ব্যবসাই এখন মার্কিন অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। তাই ভোটের প্রচারে ট্রাম্প যতই শান্তির বুলি আওড়ান, তাতে যেমন অস্ত্রোৎপাদক মার্কিন ধনকুবেররা বিভ্রান্ত হননি, তেমনই তাঁর জয়ে ইজরায়েলের যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা উল্লাসে ফেটে পড়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ইতিমধ্যেই ট্রাম্পের থেকে যুদ্ধে যাবতীয় সাহায্য অব্যাহত রাখার আশ্বাস পেয়ে গিয়েছেন। আবার এই নির্বাচনে ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় মদতদাতা মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্কও ইউক্রেনে তাঁর সংস্থা স্টারলিঙ্কের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ যুদ্ধ থামানোর কোনও ইচ্ছা বা উপায় ট্রাম্পের হাতে নেই। কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। যুদ্ধ থামানোর জন্য যে মানসিকতা, যে গণতান্ত্রিক, মানবিক, বিদ্বেষমুক্ত মন দরকার তা মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির একনিষ্ঠ সেবক ট্রাম্পের নেই। আর তা থাকলে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেই পারতেন না।

কর্মসংস্থানের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

কৃষ্ণাঙ্গ আর অভিবাসীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে কিংবা মেক্সিকো বর্ডারে প্রাচীর তুলে আমেরিকায় বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না। মেক্সিকান বা অন্য অবৈধ অভিবাসীরা মূলত কৃষি শ্রমিক, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের মতো কাজগুলি করেন, যা সাধারণত স্থানীয় শ্বেতাঙ্গরা করেন না। অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজনেই মার্কিনীরা এই সব শ্রমিকদের কাজে লাগান। আর বৈধ অভিবাসীদেরও মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আইনি অভিবাসন দেয়। বাস্তবে কর্মসংস্থানের মূল সমস্যাটা অনেক গভীরে— পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই শিকড় গেড়ে রয়েছে। বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী আর্থিক বাজারে প্রবল সংকট চলছে। চিন, জাপান, রাশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে মার্কিন পুঁজি-বাজারের সামনে। মার্কিন ধনকুবেররা উৎপাদন খরচ কমাতে বিশ্ব জুড়ে আউটসোর্সিং করছে। মার্কিন শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছে। তাই ট্রাম্প যতই বলুন, তিনি উৎপাদন শিল্পের উপর জোর দেবেন, আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে বিদেশ থেকে দেশে পণ্য ঢোকা আটকাবেন, সেটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আমেরিকা শুল্ক প্রাচীর তুললে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিও একই পথে হাঁটবে— মার্কিন পণ্যের রফতানিতে আঘাত করবে। তা ছাড়া সস্তা পণ্য আজ আর শুল্ক প্রাচীর দিয়ে আটকে রাখা যায় না। তা হলে বাইডেন প্রশাসনও সেই চেষ্টা করে দেখত। পুঁজিবাদী এই শাসকরা আজ এমন সঙ্কটে পড়েছে যে তাদের একদা বিশ্বায়ন তত্ত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে এখন শুল্ক-প্রাচীরের হুমকি দিতে হচ্ছে।

শোষণ আরও নির্মম হবে

ট্রাম্পের দ্বিতীয় বারের জয় মার্কিন জনগণের জন্য হবে আরও নির্মম। বর্ণবিদ্বেষ, নারী বিদ্বেষ আরও বাড়বে। গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরাচার আরও শক্তিশালী হবে। নব্য ফ্যাসিস্টদের উত্থান আরও বেশি করে ঘটবে। আপাদমস্তক পুরুষতান্ত্রিক ট্রাম্প শাসনে আমেরিকায় মহিলারা আরও বেশি বিদ্বেষের শিকার হবেন, আরও স্বাধীনতা হারাবেন। গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার পক্ষে ট্রাম্পের সওয়াল তার যেমন জ্বলন্ত উদাহরণ, তেমনই পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়াও তার প্রমাণ। পুঁজিবাদী শোষণ, নিষ্পেষণ আরও বেশি চেপে বসবে মার্কিন শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে। সামরিক যুদ্ধ ইরাক, লিবিয়া, আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইনের মতো আরও বেশি বেশি দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। আরও বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষ যুদ্ধের শিকার হবে। মার্কিন আগ্রাসনে দুর্বল দেশগুলিতে যতটুকু গণতন্ত্র অবশিষ্ট আছে তা-ও হারাবে। আরও বেশি কর চাপবে মার্কিন সাধারণ জনগণের ঘাড়ে। বিপুল করছাড় পাবে ইলন মাস্ক, জেফ বেজোসের মতো কয়েক শত ধনকুবের। শোনা যাচ্ছে, ধনকুবেরদের তাঁকে বিপুল সমর্থন দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে কর্পোরেট কর ৬ শতাংশ কমিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি ইতিমধ্যেই দিয়ে রেখেছেন।

পরিবেশের প্রশ্নে ট্রাম্পের মনোভাব বিশ্ব উষ্ণায়নকে কমাতে বাধা হিসাবে কাজ করবে। ট্রাম্প মনেই করেন, ক্রমবর্ধমান উষ্ণতার তত্ত্ব একটা ভাঁওতা। গতবার প্রেসিডেন্ট পদে বসেই এই সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি থেকে আমেরিকাকে বের করে নিয়েছিলেন তিনি।

এই কি গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য

বস্তুত ট্রাম্প প্রথম নন, মার্কিন সমাজে বিদ্বেষের বীজ বোনার কাজ বহু আগেই শুরু করেছেন তাঁর পূর্বতন শাসকরা। আগে যে আড়ালটুকু ছিল, পুঁজিপতি শ্রেণির ত্রাতা হিসাবে চ্যাম্পিয়ন সাজতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সে সব ছুঁড়ে ফেলে একেবারে নগ্ন ভাবে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী বর্ণবিদ্বেষ, অভিবাসী বিদ্বেষের আগুন উস্কে দিয়েছেন। গণতন্ত্রের প্রতি বরাবরই প্রবল বিরাগ ট্রাম্পের। ২০২০-এর নির্বাচনকে 'ভুয়ো' বলে দাবি করেছিলেন ট্রাম্প। একের পর এক মামলাও ঠুকেছিলেন। তাঁর উস্কানিমূলক বক্তৃতার জেরে ২০২১-র ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে অবস্থিত আমেরিকার আইনসভায় হামলা চালান তাঁর সমর্থক বর্ণবিদ্বেষী, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী কয়েকশো জনতা। তাতে নিহত হয়েছিলেন ছ'জন, জখম হয়েছিলেন ১৭৪ জন পুলিশ অফিসার। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চৌত্রিশটি ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে। তাঁর গণতন্ত্রের এমনই বহর যে তিনি এ বার নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন, নির্বাচনে হারলেও সে বার তাঁর হাউস ছাড়া উচিত হয়নি। হায়, একদা গণতন্ত্রের জননীস্বরূপা আমেরিকা! একদিন তোমারই এক মহান সন্তান আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন— গণতন্ত্রে সরকার হল, অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। সেই আমেরিকাতেই বুশ-ওবামা-বাইডেন-ট্রাম্পরা মিলে আজ সরকারের মানে দাঁড় করিয়েছে—অফ দ্য মনোপলিস্ট, বাই দ্য মনোপলিস্ট অ্যান্ড ফর দ্য মনোপলিস্ট। লিঙ্কনের আমেরিকাই আজ এক চরম অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, লম্পট ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল। সভ্যতার কত বড় অধঃপতন!

ট্রাম্প-মোদিদের বন্ধুত্ব শ্রেণিগত

এ হেন ট্রাম্পের জয়ে উল্লসিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ট্রাম্পের সঙ্গে পুরনো ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'চলুন একসঙ্গে কাজ করি।' ভারতেও বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে দক্ষিণপন্থার। আমেরিকার মতোই ভারতের মাটিতেও একচেটিয়া ধনকুবের গোষ্ঠীগুলি মদত দিচ্ছে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলিকে। প্রচার দিচ্ছে, অর্থ জোগাচ্ছে। মোদি ও তাঁর দলবল ট্রাম্পের মতোই

পাঁচের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের অর্জিত সাফল্য হারিয়ে যেতে দেওয়া চলে না

বাংলাদেশের রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাইদ দুই হাত ছড়িয়ে বুলেটকে আহ্বান করে এই উপমহাদেশের গণআন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। ঢাকার মির মুগ্ধ, মাদারিপুরের দীপ্ত, যাত্রাবাড়ির সৈকত সহ প্রায় দেড় হাজার ছাত্র-যুবক জীবন দিয়ে রক্তের অক্ষরে সে ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায় লিখে গেছেন। তাঁদের কারও নাম জানা কারও বা অজানা। তাঁদের কে মুসলমান কে হিন্দু তা জানবার দরকার ছিল না, কেউ জানতেও চায়নি। বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থানে যোগ দেওয়া সেই মেয়েটি, সেই ছেলেটি, যারা শহিদ হওয়ার স্বপ্ন নিয়েই চিঠি লিখেছিল বাবা-মাকে, তারা নিজেদের কথা রেখেছে। যে মেয়েরা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের নাম প্রধানমন্ত্রীর নাম থেকে বদলে আপসহীন ধারার স্বাধীনতা যোদ্ধা শান্তি-সুনীতি কিংবা শহিদ প্রীতিলতার নামে রেখেছেন বা যে ছাত্র-ছাত্রীরা জাত-ধর্ম নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন— তাঁরা কেউ গদিলাভের জন্য তা করেননি, করেছেন ফ্যাসিবাদী শাসনের জগদ্দল পাথরটাকে নাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে।

বাংলাদেশের কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সে দেশের ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে একটা স্তরে বিজয় অর্জন করেছে। দুনিয়ার সমস্ত বর্বর ফ্যাসিস্ট সরকারকেও লজ্জা দিতে পারে এই আন্দোলনের ওপর হাসিনা সরকারের ভয়াবহ আক্রমণ। ঠাণ্ডা মাথায় অসংখ্য মানুষকে খুন করেছে হাসিনা সরকারের পুলিশ এবং র‍্যাব। আওয়ামি লিগের অনুগত ছাত্র লিগের গুণ্ডা বাহিনীও এই হত্যাকাণ্ডে হাত লাগিয়েছিল। ছয় বছরের শিশু থেকে যুবক, নারী কিংবা পুরুষ কেউ রেহাই পায়নি এই বর্বর আক্রমণের হাত থেকে। যার ফলে মানুষের রোষ ফেটে পড়েছে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। হাসিনা সরকারের ওপর ক্ষোভ থেকেই মুজিবের মূর্তি ভাঙা কিংবা নানা জায়গায় ভাঙচুর, আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যেহেতু অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, তার সুযোগ নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী নিজেদের সাম্প্রদায়িক এবং অন্যান্য স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা প্রতিরোধে ছাত্র জনতা সহ অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এবং বামপন্থী কর্মীরা সক্রিয় হয়েছেন।

মূলগতভাবে এই গণঅভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়েছেন গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষ। ভারতের বেশিরভাগ বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এ নিয়ে নানা দোদুল্যমানতা থাকলেও এস ইউ সি আই (সি) একেবারে প্রথম দিন থেকেই এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। একই সাথে আন্দোলনের সামনে সঠিক রাজনৈতিক দিশা স্থির না করলে তা যে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না, এই হুঁশিয়ারিও সেদিন এই দলই দিয়েছিল। একটা দেশে ছাত্র জনতা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যখন অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, অকাতরে প্রাণ দেয়, তখন তা আরও বহু মানুষের প্রতিবাদের স্পৃহাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। বাংলাদেশের গণবিদ্রোহের রেশ মেলাতে না মেলাতেই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে। কেন্দ্রে বা রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলির নেতা-নেত্রীরাও বলেছেন— আর জি কর ঘটনার প্রতিবাদে মানুষের রাস্তায় নামার মধ্যে আছে বাংলাদেশ বিদ্রোহের প্রভাব। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া জনগণের এ ভাবে রাস্তায় নামার ঘটনা যে কোনও শাসকের বুকে কাঁপন ধরায়। ভারতীয় শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি যেমন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে ভয় পেয়েছে তেমনই শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ও শ্রমিকদের মধ্যে আপস-মধ্যস্থতা করে চলা মেকি বামপন্থী অর্থাৎ সোসাল ডেমোক্রেটিক দলগুলিও এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করতে ভয় পেয়েছে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিরাট বিদ্রোহ

এই অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে সে দেশের বামপন্থী দল বাসদ (মার্ক্সবাদী) বলেছে, 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এই অভ্যুত্থান এক বিরাট বিদ্রোহ— সামাজিক আন্দোলন। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিবর্তন হয়নি, কারণ এ সমাজ-বিপ্লব নয়। তাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে, পুনরুদ্ধারে এই অভ্যুত্থান তার সংগ্রামকে তীব্রতর করতে পারলে বহু দূর পর্যন্ত সফল হবে, কিন্তু যে বৈষম্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আমাদের মাথার উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে সেই বৈষম্যের ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত না রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে উচ্ছেদ করা যায় ততদিন মৌলিকভাবে বৈষম্য নিপীড়নকে খতম করা যাবে না।'

এ কথা সত্য যে, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ছাত্র-জনতা ও সাধারণ মানুষের প্রবল সমর্থন নিয়ে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে তা সামাজিক বৈষম্য দূর করা, মানুষের ওপর শোষণ-যন্ত্রণা নিবারণের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে না। স্বৈরাচারী আওয়ামি লিগ সরকারের দোসরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি স্বাভাবিকভাবেই জনগণের মধ্য থেকে উঠেছে। কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে কিছু অপশক্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে, আগুন লাগিয়েছে।

১ নভেম্বর সে দেশের বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ এই সমস্ত ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, গণঅভ্যুত্থানে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। আওয়ামি লিগ শাসনে তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। সেই শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা অভ্যুত্থানের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছে না। চুক্তির ১৮ দফা শর্ত ভঙ্গ করছে মালিকরা। অথচ মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে শ্রমিকদের বুকেই গুলি করা হচ্ছে। এটা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। তাঁরা চেয়েছেন শ্রমিক হত্যার বিচার করে দোষীদের শাস্তি দিক সরকার। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ জনগণের নিরাপত্তাহীনতা দ্রুত কাটিয়ে তোলা ও আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার দাবি তুলেছেন।

ফ্যাসিবাদ কি খতম হয়েছে?

সেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসনের আপাতত অবসান ঘটেছে ঠিকই। কিন্তু ফ্যাসিবাদের সামগ্রিক পরাজয় ঘটেনি। এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, 'ফ্যাসিবাদ আজ প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।' (সংস্কৃতির সংকট ও ফ্যাসিবাদ, রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড)। বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তার সুফল আত্মসাৎ করেছে সে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি। আওয়ামি লিগের নেতা-নেত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সাধারণ মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর ব্যবস্থা করেছেন বহু বছর ধরে, যা মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। মুক্তিযুদ্ধের কিছুদিন পরেই ১৯৭৩ সালে মহান নেতা শিবদাস ঘোষ এক আলোচনায় বলেছিলেন, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার পিছনে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলদের অবদান, বিশেষত "শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে যে দেশাত্মবোধের চর্চা হবে, তাতে মুজিবর রহমানের মতো 'ডেস্পট'ই (স্বৈরাচারী শাসক) তৈরি হবে। বাংলাদেশ অচিরেই সংস্কৃতির গভীর সংকটের মধ্যে পড়বে আর সংস্কৃতিগত আন্দোলনের এই দীনতার জন্য তার প্রগতিশীল ভাবনাধারণাগুলোও মুখ থুবড়ে পড়বে।"(শরৎচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীতে ভাষণ, ১৯৭৩)

ক্ষমতালাভের পর থেকেই অন্যান্য বুর্জোয়া শাসকের মতোই আওয়ামি লিগের নেতাদের চরিত্র যে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে শুরু করেছিল তা সেদিনই দেখা গেছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ দেখেছে জেনারেল এরশাদের পরিচালিত স্বৈরাচারী সামরিক শাসন। তার বিরুদ্ধেও সে দেশের মানুষ লড়েছেন। এর মধ্যে এসেছে বিএনপি-জামাত-এর শাসন। তারাও মানুষের গণতন্ত্রের দাবিকে পদদলিত করেছে। ২০০৯ থেকে একটানা আওয়ামি লিগের জমানা চরম স্বৈরাচারী এবং ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করেছে। এই সময় নির্বাচন পুরোপুরি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত অভ্যুত্থান ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংস্কার করে মানুষের জন্য একটু নিঃশ্বাস ফেলার পরিসর তৈরির লড়াই। তা একটা স্তর অবধি সফল হলেও দেখা যাচ্ছে মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসনিক আমলা, সেনাবাহিনীর দ্বারাই মূলত পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র-জনতার নেতৃত্বকারী ভূমিকাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে, নানা ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক শক্তি, যারা পুঁজিপতিদেরই সেবাদাস, তারাই এখন সরকারি গদিলাভের আশায় সক্রিয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দুর্বলতা ও অপদার্থতার সুযোগে পুঁজিপতিরা সেনাবাহিনীর হাতে আপাতত ক্ষমতা তুলে দিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে। নানা জায়গায় শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ দেখা যাচ্ছে, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জিগির তোলা হচ্ছে। সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী মহলের এই প্রচেষ্টা দেখিয়ে দেয় পুঁজিবাদের ধারক হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান শাসকদের মধ্যেও ফ্যাসিবাদী প্রবণতা বর্তমান। আপেক্ষিক অর্থে দুর্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সমস্ত সরকারই দেশের পুঁজিপতিদের বাজারের স্বার্থে ভারত, আমেরিকা, চিন ইত্যাদি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে নানা সময় নানা রকম বোঝাপড়া করে চলেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিকে লগ্নির সুযোগ করে দিয়ে অন্যত্র সুবিধা নিতে চেয়েছে। নিজের রাজনৈতিক খুঁটি হিসাবে এই যোগাযোগকে ব্যবহার করেছেন সেখ হাসিনা। আবার কিছু ক্ষেত্রে চিনের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সাথেও তিনি বোঝাপড়ায় গেছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং নির্বাচন পরবর্তী নতুন সরকারও এই নীতি থেকে খুব বেশি সরে যাবে এমন সম্ভাবনা কম। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি তার একচেটিয়া চরিত্রের কারণেই অন্যত্র যে সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা পালন করে তার অন্যথা বাংলাদেশেও হয়নি। তাদের এই ভূমিকা এবং এই একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে ভারত সরকার যেভাবে সেখ হাসিনার সমস্ত স্বৈরাচারী কার্যকলাপের প্রতি চোখ বুজে থেকে তাকে ভোট কারচুপিতে পর্যন্ত মদত দিয়েছে তা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

ভারতবিরোধী স্লোগানের নেপথ্যে

বাংলাদেশের আন্দোলনে বহু ক্ষেত্রেই ভারত বিরোধী স্লোগান শোনা গেছে। এতে এই আন্দোলনের সমর্থক বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন বহু মানুষ এবং বিশেষ করে ভারতের সাধারণ মানুষ ব্যথিত ও চিন্তিত হয়েছেন। ভারতের জনগণের ভেবে দেখা প্রয়োজন, এই স্লোগান কি ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে? আদৌ তা নয়। এ কথা সত্য যে, ভারতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আর ভারতের চাষি, মজুর, ছাত্র, সাধারণ মানুষের স্বার্থ এক নয়। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজি বাংলাদেশ সহ এশিয়া আফ্রিকার নানা দেশে যে ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া কিছু নয়। তাই বাংলাদেশের আন্দোলন থেকে যে স্লোগান উঠেছে তা ভারতীয় পুঁজির সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের বিরুদ্ধে, ভারতের মেহনতি জনতার বিরুদ্ধে নয়। বাংলাদেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ মনে করেন, ভারতের মেহনতি জনগণ তাঁদের বন্ধু, লড়াইয়ের সাথী। বাস্তবেও ভারতের গণতন্ত্রকামী প্রগতিশীল মানুষ সক্রিয়ভাবে সাহসের সাথে এই গণঅভ্যুত্থানের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বহু সভায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষ ভারতীয় জনগণের এই সমর্থন এবং ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্মরণ করেন বারবার।

বাংলাদেশের মানুষের চোখে ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকা 'অধীনতামূলক মিত্রতা' হিসাবেই প্রতিভাত

ছয়ের পাতায় দেখুন

আর জি কর আন্দোলনের লক্ষ্য

একের পাতার পর

একটি হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে গড়ে ওঠা গণআন্দোলন ঐতিহাসিক মাত্রা পায়। নেতৃত্বকারী জুনিয়র ডাক্তাররা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। ন্যায়বিচার সহ স্বাস্থ্যব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টানো ও চিকিৎসকদের সুরক্ষার যে দশ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার বেশ কয়েকটি অর্জিতও হয়।

জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার

আন্দোলনের এই সময়কালে চিকিৎসা পরিষেবা সঙ্গত কারণেই খানিকটা ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও রোগী ও তাঁদের পরিজনরা আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের পাশেই ছিলেন। অথচ দেখা যায়, পুরো সময় জুড়ে সরকার নানাভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার অবনতির জন্য জুনিয়র ডাক্তারদের দায়ী করতে চেয়ে নানা মিথ্যে প্রচার চালাতে থাকে। এ নতুন কিছু নয়। গত কয়েক দশক ধরে যখনই পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা রাজ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি বা মেডিকেল কলেজগুলিতে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের ধর্মঘটের মতো ঘটনা ঘটেছে, প্রতিবারই দেখা গেছে, বিশেষ করে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনে নামলেই শাসকদের মধ্যে একটা ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে যায়। কারণ এই আন্দোলনে ক্ষমতাসীন সরকারের উপর একটা চাপ তৈরি হয়, এমনকি তাদের ভোটব্যাঙ্কেও টান পড়ে। ফলে শাসকরা আন্দোলনকারীদের উপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করে। অনেক সময় শাসক দলের গুন্ডাবাহিনীও লেলিয়ে দেওয়া হয়, সাধারণ মানুষকে উস্কানি দিয়ে তাদের ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্ররোচিতও করা হয়।

কিন্তু জুনিয়র ডাক্তাররা কাজ না করলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে এত শোরগোল তোলা হয় কেন? এঁরা তো শিক্ষানবিশ। তাহলে এঁরা কিছুদিন কাজ না করলেই পরিষেবার এত বিঘ্ন কেন ঘটে? সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা কি তাহলে এঁদের উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে?

দেখা যাক, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কী।

বর্তমানে এ রাজ্যে হাউসস্টাফ, পিজিটি, পিডিটি সব মিলিয়ে সরকারি হিসেব অনুযায়ী জুনিয়র ডাক্তারের সংখ্যা মোটামুটি সাত হাজারের কাছাকাছি। রাজ্যে মেডিকেল কলেজ মোট ২৬টি। এর নিচে জেলা, মহকুমা স্তরের হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং আরও নিচে রয়েছে গ্রামীণ হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যম ও প্রাথমিক স্তরের হাসপাতালগুলি। এই সব হাসপাতালে কিন্তু জুনিয়র ডাক্তার নেই। ঘটনা হল, বর্তমানে জেলা হাসপাতাল বাদ দিলে মধ্যম স্তরের হাসপাতালগুলিতে ৩৫ শতাংশের উপরে বিশেষজ্ঞের পদ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। কোনও কোনও বিভাগে ডাক্তার ঘাটতির মাত্রা মাঝেমধ্যেই চরমে পৌঁছয়। সরকার নতুন করে বিশেষজ্ঞ পদে স্থায়ী নিয়োগ করছে না। ফলে একেবারে অস্থায়ী ও নবীন বিশেষজ্ঞদের উপরেই বর্তমানে মধ্যম স্তরের পরিষেবার দায় এসে পড়েছে। তৈরি হচ্ছে পরিষেবায় নানা ধরনের সঙ্কট।

জেলার হাসপাতালে পরিকাঠামোর বেহাল দশা

মধ্যম স্তরের হাসপাতালগুলিতে বেড, পরিকাঠামো এবং লোকবলের বিপুল ঘাটতি থাকায় জটিল যে সব রোগের চিকিৎসা এই স্তরে হওয়ার কথা, তা হয় না। ফলে গ্রাম এবং শহরের বেশিরভাগ রোগীর চাপ গিয়ে পড়ে শহরের মেডিকেল কলেজগুলিতে। প্রাথমিক স্তরের হাসপাতালেও বিপুল পরিকাঠামো ঘাটতি রয়েছে। এই স্তরে জনসংখ্যার নিরিখে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যায় ঘাটতি রয়েছে মোটামুটি ৬৯ শতাংশ এবং ব্লক স্তরের গ্রামীণ হাসপাতালের ঘাটতি ৫৮ শতাংশ। মূলত ১৯৯১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে হিসাব করা হয়েছিল, তাতেই মেডিকেল অফিসারের ঘাটতি ছিল প্রায় ৩৫ শতাংশ। বর্তমান জনসংখ্যা এবং ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হিসাব করলে এই ঘাটতি আরও অনেক বাড়বে। অন্য দিকে গ্রামীণ হাসপাতালে বিশেষজ্ঞের পদ বর্তমানে ৯০ শতাংশের উপরে ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ফলে এই স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রেফারাল পরিষেবা দুটোই ভীষণভাবে মার খাচ্ছে, যার দরুণ প্রায়শই প্রাথমিক স্তরেররোগীর ভির সরাসরি গিয়ে পড়ে মধ্যম স্তরে এবং মেডিকেল কলেজ স্তরে। একইভাবে, মধ্যম স্তরের রোগীর ভিড় সরাসরি অথবা রেফার হওয়ার ফলেও মেডিকেল কলেজে গিয়ে পড়ছে। এক কথায় সরকারি নিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম হওয়ার কারণেই রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সরকারি নীতির ফলে ভুগছে মেডিকেল কলেজগুলোও

মেডিকেল কলেজগুলোর সাম্প্রতিক চেহারাটা কী? সেখানেও লোকবল এবং পরিকাঠামোর অভাব। সম্প্রতি মেডিকেল কাউন্সিলকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভেঙে দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক 'ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন' (এনএমসি) তৈরি করার ফলে মেডিকেল কলেজগুলির নিয়মাবলি ভীষণভাবে শিথিল করা হয়েছে। সরকার চটকদার ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে যত্রতত্র মেডিকেল কলেজ খুলে দিয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় অধ্যাপক নেই, ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই, হস্টেল নেই, তবুও দিব্যি চলছে। 'মেডিকেল কলেজ'-এ মেডিকেল অফিসারের পদ তুলে দেওয়ার ফলে সম্পূর্ণ রোগীর চাপ এসে পড়ে শিক্ষক-চিকিৎসকদের উপরে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এত শিথিল করার পরেও শিক্ষকপদ প্রায় ৪০ শতাংশ ফাঁকা পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মীর পদও বিপুল সংখ্যায় ফাঁকা পড়ে আছে। যেমন বিভিন্ন টেকনিক্যাল পদে প্রায় ৩০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে, নার্সিং-কর্মীদের পদে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ঘাটতি। জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, রোগীকে তাৎক্ষণিক আরাম বা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম,

ছয়ের পাতায় দেখুন

'পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি চাই' মোটরভ্যান চালকদের সম্মেলনে দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি, লাইসেন্স দেওয়া এবং পুলিশি হয়রানি বন্ধের দাবিতে ৯ নভেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নিমতৌড়িতে। মূল প্রস্তাবের উপরে আলোচনা করতে গিয়ে উপস্থিত পাঁচশোর বেশি প্রতিনিধির অনেকেই নিত্যদিনের জীবনযন্ত্রণা ব্যক্ত করেন। প্রতিনিধিরা তাঁদের দাবিগুলি নিয়ে ইউনিয়নের নেতৃত্বে জোরদার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। সম্মেলন থেকে অমিত মান্নাকে সভাপতি, শেখ নুরুল ও সঞ্জয় জানাকে যুগ্ম সম্পাদক করে শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠিত হয়।

চারশোর বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন। কমরেড নয়ন কর্মকারকে সভাপতি ও সঞ্জয় গড়াইকে সম্পাদক করে ২৮ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। শ্রমিক নেতা কমরেড বিশ্বজিৎ ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। দুটি সম্মেলনেই ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা মোটরভ্যান বন্ধে মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির আপসকামী ভূমিকা উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে তীব্র ও ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলায় বিশেষ গুরুত্ব দেন।

বাঁকুড়া ঃ সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দ্বিতীয় বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন ১০ নভেম্বর শহরের ধর্মশালা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এআইইউটিইউসি-র আসন্ন রাজ্য ও সর্বভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন সফল করতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান তিনি।

স্বরূপনগরে নির্মাণকর্মী সম্মেলন

৭ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর মাঝেরপাড়া প্রাইমারি স্কুলে আয়োজিত হয় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা নির্মাণকর্মী ইউনিয়নের স্বরূপনগর ব্লক তৃতীয় সম্মেলন। ব্লক সভাপতি কমরেড অজিত মণ্ডলের সভাপতিত্বে আয়োজিত সম্মেলনে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন ব্লক সম্পাদক ছোট্টু মির্জা। শ্রমিক প্রতিনিধিরা নিজেদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন।

কল্যাণ প্রকল্প থেকে শিক্ষা, যন্ত্রপাতি, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বেনিফিট তুলে দেওয়া, নতুন রেজিস্ট্রেশন-নবীকরণে চরম প্রশাসনিক গাফিলতি প্রভৃতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গৌতম দাস। সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড জয়ন্ত সাহা এআইটিইউইউসি-র আসন্ন রাজ্য ও সর্বভারতীয় সম্মেলনকে সফল করার আহ্বান জানান। কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ব্লক কোষাধ্যক্ষ কমরেড বেলা পাল। কমরেড সোহারাব আলিকে সভাপতি ও কমরেড অজিত মণ্ডলকে সম্পাদক নির্বাচন করে ১৭ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নতুন ওয়েবসাইট - sucic.org

প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলি হানাদারি বন্ধের দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে দলের বিক্ষোভ

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

পাটনা, বিহার

আগরতলা, ত্রিপুরা

আর জি কর ঃ অবিলম্বে বিচারের দাবিতে তমলুকে প্রতিবাদ মিছিল

‘কেটে গেছে ৯০ দিন, আজও অভয়া বিচারহীন’। আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ৯ আগস্টডাক্তার ছাত্রীর নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ৯ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয় ‘আমরা তমলুকবাসী’র পক্ষ থেকে। তমলুক হাসপাতাল মোড়ে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে স্লোগান মুখরিত ও বিভিন্ন দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে মানিকতলার মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি পর্যন্ত যায়। গান আবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান নাগরিকরা। সিবিআই-এর নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ জানানো হয়। কেবল সঞ্জয় রায়ের নামে চার্জশিট দিয়ে বাস্তবে দোষীদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়। থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে ও নারীদের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রশাসনিক ভূমিকার দাবি ওঠে।

ধনকুবেরদেরই বিশ্বস্ত প্রতিনিধি ট্রাম্প

দুয়ের পাতার পর

জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে আড়াল করতে মুসলিম অনুপ্রবেশকেই দায়ী করেন, কুসংস্কার, উগ্র জাতীয়তা ও ধর্মবিদ্বেষে উস্কানি দেন, সংকটে জর্জরিত সাধারণ মানুষের ঐক্য নষ্ট করার অপচেষ্টা চালান। বর্ণবিদ্বেষী, স্বৈরাচারী ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির আদর্শগত এই মিল, আসলে তাঁদের শ্রেণিগত মিল, যা তাঁদের মিলিয়ে দিয়েছে। চিন সম্পর্কে ট্রাম্পের কট্টর মনোভাব বিজেপি নেতাদের খুশি করেছে। যদিও অভিবাসীদের নিয়ে ট্রাম্পের কড়াকড়িতে ভারতীয় সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি কর্মীদের এইচ-১বি ভিসা পেতে সমস্যা হলে তা তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভারতীয়দের আমেরিকায় কাজ পেতে খুবই অসুবিধায় ফেলবে। গত এক বছরে ১১০০ জন ভারতীয় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে ভারতে ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। কড়াকড়ি হলে সংখ্যাটা আরও বাড়তে থাকবে।

তা ছাড়া বর্তমানে ভারতের আমেরিকা থেকে আমদানির পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন ডলার। রফতানি ১২৫ বিলিয়ন ডলার। আমদানি শুল্কের পরিমাণ বাড়লে ভারতীয় পণ্যের রফতানি মার খাবে। ট্রাম্পের জয়ে বিজেপি নেতাদের এই উল্লাস তাই কতখানি স্থায়ী হবে ভবিষ্যতই বলবে। তবে বাইডেন সরকারের আমলে মোদি সরকারকে মানবাধিকার, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে যে লাগাতার সমালোচনার মুখোমুখি হতে হচ্ছিল তাতে হয়তো কিছুটা রাশ পড়তে পারে। কারণ ট্রাম্পের নিজেরই ও-সবের বালাই নেই।

সংগ্রাম ছাড়া
শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি নেই

তাই যত বিপুল সমর্থন নিয়েই আসুন ট্রাম্প, তাঁর কাছ থেকে মার্কিন সাধারণ ও শ্রমজীবী জনগণের পাওয়ার কিছুই নেই, বরং যা ছিল তা-ও তাদের হারাতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি তীব্র হবে, ছাঁটাই বাড়বে, দক্ষিণপন্থার বাড়বাড়ন্ত ঘটবে, বিদ্বেষের বিষ আরও বেশি করে ছড়াবে সমাজ জুড়ে, আর্থিক বৈষম্য আরও তীব্র হবে। অন্য দিকে গণতন্ত্রকামী মানুষের আন্দোলন বিশ্ব জুড়ে প্রবল বাধার সম্মুখীন হবে। সাম্রাজ্যবাদী হামলার শিকার হবেন আরও বেশি বেশি করে নিরীহ মানুষ। আমেরিকার শোষিত জনগণের পক্ষ থেকে জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া শাসকরা শোষিত মানুষের কথা এতটুকুও কানে তুলবে না।

নন্দীগ্রাম আন্দোলন স্মরণে

২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সি পি এম দুষ্কৃতীদের আক্রমণে শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান শ্যামলী মান্না ও রেজাউল করিম। সেই সাথে মিছিলে অংশ নেওয়া অসংখ্য মানুষও আহত হন। দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস হিসাবে পালন করল এসইউসিআই(সি)। নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা কমিটির সদস্য ভবানীপ্রসাদ দাস, লোকাল কমিটির সম্পাদক মনোজ কুমার দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি

শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি বেতন দিতে হবে, শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র দীর্ঘদিনের দাবি। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সল্টলেকে পি এফ-এর রিজিওনাল কমিটির মিটিংয়ে শ্রম দপ্তরের সচিব বিষয়টি মেনে নিয়ে বলেছিলেন, বিভিন্ন কাজে কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কারদের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল এমপ্লয়ারদের দায়িত্ব নিতে হবে শ্রমিকদের বেতনের টাকা সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়ার। তিনি এও বলেছিলেন, পি এফ-এর উভয় পক্ষের টাকা পি এফ অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা করতে হবে। সাথে সাথে কন্ট্রাক্টরদের প্রাপ্য টাকাও তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

কিন্তু অদ্ভুতভাবে লক্ষণীয় এই বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা নেওয়া হচ্ছে না।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রম দপ্তরে স্মারকলিপি দিয়ে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ করার দাবি জানান।

১২ দিনের বেগার শ্রম মিড-ডে মিল কর্মীদের

১৯ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর, ১২ দিন কাজ করিয়ে এক পয়সাও মজুরি দেওয়া হল না এ রাজ্যের মিড-ডে মিল কর্মীদের। এ রাজ্যে ২ লক্ষ ৪৫ হাজারের মতো মিড-ডে মিল কর্মী রয়েছেন। তাঁরা প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিল রান্না করে থাকেন। ওই সময়টা সাধারণভাবে পুজোর ছুটি থাকলেও প্রাথমিক স্কুলে ক্লাস চলে। তা হলে কাজ করিয়ে বেতন দেওয়া হবে না কেন?

শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বারবার সোচ্চার হয়েছে। ১৮ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠিয়ে বেতন দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এ ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দেশের শ্রমআইন অনুযায়ী, কোনও মানুষকে কাজ করালে তাকে অবশ্যই পারিশ্রমিক দিতে হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরে তা চরমভাবে লঙ্ঘিত। শিল্পক্ষেত্রে একে বলা হয় শ্রম চুরি। শিক্ষাক্ষেত্রে একে কী বলা হবে?

এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানিয়ে পোস্টার হাতে ছাত্রদের প্রচার। ভিওয়ানি, হরিয়ানা।

আর জি কর আন্দোলনের লক্ষ্য

চারের পাতার পর

সেই পদে ঘাটতি প্রায় ৬৫ শতাংশ, সুইপার পদে ৬৮ শতাংশ। এই হল রাজ্যে চিকিৎসা পরিকাঠামোর চেহারা, যাকে আড়াল করতে যাবতীয় দোষ এ বার চাপানো হল আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের ওপর।

জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনে নামেন বাধ্য হয়েই

কাজ শেখার জন্য জুনিয়র ডাক্তারদের দিনরাত এক করে চিকিৎসার কাজে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়। অথচ তাঁদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কী? সেখানে না আছে থাকার বা বিশ্রামের জায়গা, না আছে কাজের উপযুক্ত জায়গা। আর ন্যূনতম নিরাপত্তা যে নেই, সে তো অভয়াই প্রমাণ করলেন জীবন দিয়ে। টানা ৩৬ ঘণ্টা, ৭২ ঘণ্টা ডিউটি, একের পর এক নির্ঘুম রাত। চারিদিকে দালাল, উন্মাদ, মাতাল অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে— কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। কোথাও কোথাও কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশেই নানা অবৈধ কাজ চলছে। তার চাপ এসে পড়ছে জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর। এরকম একটা নৈরাজ্যের মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজ করতে হয় এবং প্রথম থেকেই ঘাটতি হওয়া সিনিয়র ডাক্তারদের দায়িত্ব এমনকি অন্যান্য সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্বও কাঁধে নিতে হয়। এভাবেই তাঁদের ওপর ভর করে কাজ চলে যায়, হাসপাতাল চলতে থাকে। আর সরকার তার দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে খুশি হয়ে ভাবে, এত পদ ফাঁকা থেকেও যদি হাসপাতাল দিব্যি চলে, তা হলে আর নিয়োগ করার দরকার কী? প্রতি বছর সাড়ে চার হাজার এমবিবিএস ডাক্তার পাশ করে বেরোচ্ছেন, তিন হাজারের উপরে এমডি, এমএস বেরোচ্ছেন। অথচ কোনও নিয়োগ নেই। জনগণের অর্থের, মানবসম্পদের কী বিপুল অপচয়!

সরকারের অবহেলায় সৃষ্ট এরকম একটা অরাজক পরিস্থিতিতে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটাতে হয় জুনিয়র, সিনিয়র ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের। এর পর যখন ঘটে যায় বড়সড় অঘটন, ডাক্তার নিগ্রহ বা অন্য কোনও ভয়ানক ঘটনা, তখন ডাক্তারদের অত্যন্ত সঙ্গত ক্ষোভ ও প্রতিবাদ চাপা দিতে এবং নিজেদের অপদার্থতা ঢাকতে চিকিৎসা পরিষেবা ব্যহত হওয়ার কাঁদুনি গাইতে থাকেন সরকারের মন্ত্রী-নেতারা। এ বার আরজি কর-এর ঘটনার ক্ষেত্রেও ঠিক এটাই ঘটেছে।

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন সমগ্র সমাজের স্বার্থেই

বর্তমানে অভয়া আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য কিছু মহল থেকে একটা কথা তোলা হচ্ছে যে, ডাক্তাররা নিজেদের পেশাগত দাবি বেশি রাখছেন, আড়ালে চলে যাচ্ছে অভয়ার ন্যায়বিচারের কথা। অথচ বাস্তব ঠিক বিপরীত। মনে রাখা দরকার, আগের সরকারের আমল থেকেই বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে, হাসপাতালে গড়ে ওঠা যে দুর্নীতির দুষ্টচক্র এবং তাকে সামাল দিতে শাসকদলের মদতপুষ্টদের কল্যাণে জাঁকিয়ে বসা থ্রেট কালচার, এরই শিকার হয়েছেন অভয়া। আন্দোলনকারী ডাক্তাররা যে দাবিগুলো রেখেছেন, তা কখনওই শুধু তাদের পেশাগত দাবি নয়, এগুলির সাথে ডাক্তার সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর সুরক্ষা, হাসপাতালের পরিবেশ রক্ষা এবং অবশ্যই সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার প্রশ্নটিও অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত। জুনিয়র ডাক্তাররা এর আগেও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন করার দাবি জানিয়েছেন বারবার, এ বারের দশ দফা দাবিও তাই।

প্রশ্ন ওঠে, স্বাস্থ্যব্যবস্থার যে পরিকাঠামো এমনিতেই থাকার কথা, তা নিয়ে ডাক্তারদের বারবার আন্দোলন, ধর্মঘট করতে হচ্ছে কেন? সরকার সত্যিই যদি জনমুখী স্বাস্থ্যের কথা ভাবত, তা হলে তো এ নিয়ে দাবি তোলার, ধর্মঘট করার দরকার পড়ত না। আসলে এখানেই লুকিয়ে আছে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ডাক্তারদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন করার কারণ। বিগত সিপিএম সরকারের ইতিহাস এবং আজকের তৃণমূল সরকারের চূড়ান্ত অপশাসনকে মেলালেই বোঝা যাবে, মুখে জনগণের সেবার কথা বলে চিকিৎসা নিয়ে লাভজনক ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়াই এদের আসল উদ্দেশ্য। জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি, সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে কর্পোরেট মালিকের হাতে ক্রমাগত তুলে দেওয়ার নানা প্রকল্প, যার পরিণামে মেডিকেল কলেজ থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত পরিকাঠামো এবং লোকবলের ব্যাপক ঘাটতি, ভোটের আগে চটকদার নানা স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং জুনিয়র ডাক্তারদের দিনরাত এক করে অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য করা— এ সবই সেই স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণেরই অংশ।

সরকার আর চাইছে না স্থায়ী ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীর দায়িত্ব বহন করতে। সেই জন্যেই আজ স্বাস্থ্যব্যবস্থা অনেকটাই জুনিয়র ডাক্তার নির্ভর হয়ে উঠেছে। আর এই অব্যবস্থার প্রতিবাদে যখন জুনিয়র ডাক্তাররা জোট বেঁধে আন্দোলন করছেন, তখন উল্টে তাদের ওপর দোষ চাপিয়ে আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে শাসক দল ও সরকার। তাই অভয়ার ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই ঐতিহাসিক আন্দোলন আজ শুধু একটি দাবিতেই সীমাবদ্ধ নেই। সমাজে অভয়ার মতো ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সাধারণ মানুষ যাতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পান, হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে নির্ভয়ে সুস্থ পরিবেশে কাজ করতে পারেন, সেই সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য নিয়ে এই আন্দোলন আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, আরও সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

বাংলাদেশ গণঅভ্যুত্থান

তিনের পাতার পর

হয়। আপত্তি ওঠে সেখানে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভারতীয় পুঁজিপতিদের লুঠের আয়োজন, সে দেশের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক বিষয়ে ভারত রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক ও মেহনতি জনতা কখনওই মেনে নিতে পারেনি। যেমন একইভাবে ভারতে অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা, নানা ভাবে আধিপত্য কায়েমের চেষ্টা এ দেশের দেশপ্রেমিক মানুষ কখনওই মুখ বুজে মেনে নেননি, মেনে নেন না। বাংলাদেশের মানুষও ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকাকে এই দৃষ্টিতে দেখেন।

সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ গণঅভ্যুত্থানের চেতনা বিরোধী

ভুললে চলবে না যে, বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁরা কেউ 'মুসলমান ঐক্যে'র বা 'হিন্দু ঐক্যের' জন্য প্রাণ দিতে যাননি। মাদারিপুরের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক দীপ্ত দে, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রুদ্র সেন, যাত্রাবাড়িকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করার অন্যতম কারিগর সৈকত চন্দ্র দে সহ অসংখ্য শহিদ যখন প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের রক্তের সাথে মিশেছে যাঁদের রক্ত তাঁরা কে কোন ধর্মের কেউ প্রশ্ন করেনি। ওই আন্দোলনের সময় দেখা গেছে মন্দির পাহারা দিচ্ছে মাদ্রাসার ছাত্ররা।

এমন বহু গৌরবোজ্জ্বল বিষয় সত্ত্বেও অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্বলতা, অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রশাসনিক শূন্যতার সুযোগে নানা জায়গায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ হয়েছে। যদিও একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, বিগত তিন মাসে এমন বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে। আওয়ামি লিগের যে সব নেতা ও তাদের লাঠিয়ালদের বিরুদ্ধে জনরোষ ফেটে পড়েছে, তাঁদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই ছিলেন। কিন্তু সে ঘটনা সাম্প্রদায়িক কারণে ঘটেনি। বাংলাদেশের সব শাসক দল নানাভাবে সে দেশে ধর্মীয় মৌলবাদকে উৎসাহ দিয়েছে। আওয়ামি লিগের শাসনকালে যুক্তিবাদী-মুক্তমনা মানুষদের ওপর বারবার আক্রমণ হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপরেও আক্রমণ হয়েছে। এখন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই শক্তিগুলি আরও মাথা তুলতে চাইছে। সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ, স্থাপত্য ভাঙচুর, লাইব্রেরি লুঠ, ধর্মস্থানে আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা এই গণঅভ্যুত্থানের সমর্থক মানুষজনকে ভীষণভাবে ব্যথিত করেছে। মূলত তিন ধরনের শক্তি এই আক্রমণ করছে— প্রথমত, কিছু সুযোগসন্ধানী যারা কোনও কিছু ঘটলেই তার থেকে সুযোগ নেয়। দ্বিতীয়ত, এই গণঅভ্যুত্থানকে কালিমালিপ্ত করবার মরিয়া প্রচেষ্টা চালানো ফ্যাসিসট শক্তির প্রতিভূরা। তৃতীয়ত, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি। মনে রাখা দরকার, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ ভারতের মতোই বাংলাদেশেও নতুন কিছু নয়, ভারতবর্ষ সহ সারা দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আজ সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতি শ্রেণির এক সাধারণ কৌশল। গণঅভ্যুত্থানকে কালিমালিপ্ত করবার জন্য স্বার্থান্বেষীরা যেমন ভাস্কর্য ভেঙেছে, অন্যদিকে গণতন্ত্রকামী মানুষজন ও শিল্পীরা, সেই ভাস্কর্য সারানোর জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছেন। এ জাতীয় বহু আশাব্যঞ্জক ঘটনার সাক্ষী এই সময়টা। যদিও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই বহু ক্ষেত্রে এই আশাব্যঞ্জক দিক ও সাধারণ মানুষের সদর্থক ভূমিকার কথা ভারতে অন্তত বিশেষ উচ্চারিত হচ্ছে না। বাংলাদেশে এখন কেউ কেউ হিন্দু ঐক্যের যে স্লোগান তুলছেন তার সাথে ভারতে বিজেপির স্লোগান অনেকটা মিলে যায়। এই প্রচেষ্টা মুসলিম মৌলবাদকেও উৎসাহ দেবে। তাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠার রাস্তাটাই ধাক্কা খাবে। বাস্তবে মুসলিম কিংবা হিন্দু উভয় মৌলবাদই গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থান অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে মানুষের রুখে দাঁড়ানোর যে নজির সৃষ্টি করেছে তা ভারত সহ বিশ্বের খেটে খাওয়া গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে প্রেরণা। বাংলাদেশের শোষিত মানুষ, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ গণঅভ্যুত্থানের অর্জিত সাফল্যকে বিপথগামী করতে দেবে না, প্রতিরোধ করবেই।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মৈপীঠ বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রবীণ মহিলা কর্মী কমরেড লক্ষ্মী জানা বার্ধক্যজনিত কারণে ২৭ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র এলাকার কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লাল্টু সর্দার, লোকাল সম্পাদক কমরেড দুলাল মিদ্দে সহ অন্য নেতা-কর্মীরা। প্রতিবেশীরাও শেষবারের মতো তাঁকে দেখতে উপস্থিত হন এবং শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড লক্ষ্মী জানা শৈশবেই কৃষক আন্দোলনের স্বাদ পেয়েছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর বাবা-কাকাদের সাথে নানা কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। এই পরিবারটি ওই এলাকায় এস ইউ সি আই (সি) দলের শুরু থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত। পরে বিবাহসূত্রে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক পার্টি পরিবারে আসেন। মৈপীঠে '৯০-এর দশকে তৎকালীন শাসক সিপিএমের দীর্ঘ দিনের সন্ত্রাস ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে কোনও আন্দোলনে তাঁকে সামনের সারিতে দেখা যেত। সাংসারিক অভাব-অনটন সত্ত্বেও বাইরে থেকে কমরেডরা দলীয় কাজে গেলে তাঁর বাড়িতে যেমন নিরাপদ আশ্রয় পেতেন, তেমনই শুধু এলাকায় নয়, গ্রামের মহিলাদের সংগঠিত করে কলকাতার বিভিন্ন কর্মসূচিতেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। এলাকায় বা বাইরে কোথাও দলীয় কর্মীদের কোনও বিপদের কথা শুনলেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। পার্টির যে কোনও আন্দোলনের জয়ের খবরে খুব আনন্দিত হতেন। বয়সের ভারে যখন শয্যাশায়ী, সেই অবস্থাতেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি কমরেডদের খোঁজখবর নিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন আদর্শবান, কর্মোদ্যোগী এবং উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন সাথীকে। এলাকার অগণিত মানুষ হারালেন তাঁদের আপনজনকে।

কমরেড লক্ষ্মী জানা লাল সেলাম

ভোটে লড়াই জমজমাট, কিন্তু তাতে জনগণের কী?

নির্বাচন কেন হয়? লোকসভা কিংবা বিধানসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত কিংবা পৌরসভা নির্বাচনে জনগণের কাজ ভোট দিয়ে শাসক বেছে নেওয়া। কিন্তু সেই শাসকরা জিতে কী করে? তাদের জেতা-হারার সাথে কি জনস্বার্থের আদৌ কোনও সম্পর্ক থাকে? যদি থাকে, তাহলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে অবতীর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রচারের সময় কী কী বিষয় তুলে ধরবে? জিতে তারা জনস্বার্থে কী কী করবে, কোন কোন নীতিতে তারা অন্যের থেকে আলাদা— এই কথাগুলি তাদের বলতে হবে তো! কিন্তু দেখা যায় দেশে বা রাজ্যে একটার পর একটা নির্বাচন পেরিয়ে যায়, তাতে যারা জেতে কিংবা যারা তাদের কাছাকাছি প্রতিদ্বন্দ্বী, তাদের প্রচারের মূল বিষয় এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে জাতপাত আর সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক প্রচার। কখনও তা উগ্র, কখনও তা একটু নরম, পার্থক্য এইটুকুই। সারা দেশে মানুষের সমস্যা যখন মূল্যবৃদ্ধি, সমস্যা যখন বেকারত্ব, সমস্যা যখন ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, সমস্যা যখন কৃষকের ফসলের উপযুক্ত দামের অভাব, সমস্ত সরকারি কাজে স্তরে স্তরে দুর্নীতি ইত্যাদি— তখন দেখা যাচ্ছে এক একটা নির্বাচনে এগুলি মুখ্য বিষয় হয়ে উঠছে না! উদাহরণ হিসেবে দেখা যাক একেবারে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের কালে মহারাষ্ট্রের ভোট প্রচারের মঞ্চকে।

মহারাষ্ট্র রাজ্যটি আর্থিক দিক থেকে উন্নত এবং সামাজিকভাবে অগ্রসর বলে ধরা হয়। সেই মহারাষ্ট্রে প্রধান দুটি জোট ভোট ময়দানের প্রতিদ্বন্দ্বী। একটি হল এনডিএ-র মহায়্যুতি জোট যার শরিক বিজেপি, শিবসেনা (শিন্ডে) এবং এনসিপি (অজিত পাওয়ার)। অপরটি মহাবিকাশ আগাড়ি বা এমভিএ, যার শরিক হল— এনসিপি (শরদ পাওয়ার), কংগ্রেস এবং শিবসেনা (উদ্ধব বাল ঠাকরে)। সেই 'অগ্রসর' রাজ্যে ভোটের আগে দেখা গেল এক বিজেপি নেতা প্রকাশ্য সভায় কংগ্রেসের এক নেতার কন্যার উদ্দেশে নোংরা মন্তব্য করছেন। শ্রোতারাও তা উপভোগ করে প্রবল হাততালি দিচ্ছেন। যথারীতি কংগ্রেস নেতারা এর বিরুদ্ধে সোস্যাল মিডিয়াতে সরব হলেন এবং বিজেপি নেতা ও সমর্থকরা খুঁজতে থাকলেন এর আগে কবে কংগ্রেসের কোন কোন নেতা বিজেপির কোন কোন মহিলা সমর্থকের উদ্দেশে কী কী খারাপ কথা বলেছেন। অবশ্যই তাঁদের বেশি খুঁজতে হয়নি, একই ধরনের বেশ কিছু উদাহরণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতারা জোগাড় করে ফেলেছেন। ভুলে গেলে চলবে না, মহারাষ্ট্রে মহিলাদের শ্লীলতাহানী, ধর্ষণের মতো মামলা পুলিশে জমা পড়ে প্রতিদিন গড়ে ১২১টি। আর শিশুদের ওপর এই ধরনের ঘটনার অভিযোগ নথিভুক্ত হয় প্রতিদিন গড়ে ৫৫টি। নথিভুক্ত হয় না এমন ঘটনার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই আরও বেশি। সম্প্রতি সে রাজ্যের বদলাপুরে স্কুলে শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগ চাপা দিতে পুলিশের জঘন্য ভূমিকা নিয়ে সোচ্চার হতে হয়েছে বোম্বে হাইকোর্টকে। এই রাজ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের নারীদের মর্যাদা নিয়ে এই যখন মনোভাব, তারা কি কেউই নারী নির্যাতন বন্ধ করতে পারবে? মহারাষ্ট্রের বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ আছে। এদিকে কংগ্রেস এনসিপি-র বিরুদ্ধেও তা কম নেই। কংগ্রেস-এনসিপি-র একাধিক নেতা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়েই বিজেপিতে নাম লিখিয়ে সাংসদ পদ থেকে মন্ত্রিত্ব পেয়ে গেছেন। ফলে দু-জনের কারও পক্ষেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা অসম্ভব।

অবশ্য এ নিয়ে দুই জোটেরই মাথাব্যথা বিশেষ নেই। উভয়েরই এখন প্রধান ইস্যু হল জাতপাত এবং হিন্দুত্ব। সমস্ত কিছুকে পিছনে ঠেলে দিয়ে এখন ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিসরে জাত নিয়ে লড়াই মহারাষ্ট্রে যেন প্রধান হয়ে উঠছে। এই মহারাষ্ট্রের বুকে একদিন জ্যোতিবা ফুলে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন জাতপাতের বিভেদ দূর করার জন্য। আধুনিক মনন গড়ে তোলা, ধর্মীয় ও জাতভিত্তিক সংকীর্ণতা ভেঙে আধুনিক মনন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছিল তাঁর লড়াই। সেই মহারাষ্ট্রে জাতপাত ভিত্তিক উগ্র আবেগ জনমানসে তীব্র করে তুলতে সচেষ্ট সমস্ত ভোটবাজ দলই। নিজ নিজ ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে তারা যা করছে তাতে সাধারণ মানুষের মধ্যেকার স্বাভাবিক ঐক্য ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। এবারের ভোটে নতুন করে মারাঠা পরিচিতির সাথে ওবিসি পরিচিতির দ্বন্দ্ব তীব্র এবং তিক্ত জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে বিজেপি এবং কংগ্রেস উভয়েই। মারাঠা আত্মপরিচয় এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদের জিগির তুলে মহারাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করেছে শিবসেনা। এতে মদত দিয়েছে বিজেপি এবং নানা সময়ে কংগ্রেস ও তার থেকে ভেঙে আসা এনসিপি। এখন গদির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শিবসেনা ভেঙে দুই ভাগ হয়েছে। এনসিপিও দুই টুকরো। তারা সকলে এমন জাতপাতের জটিল সমীকরণ তুলছে যে, এই দ্বন্দ্বের সুফল নিতে গিয়ে সব দলগুলোই বিপাকে পড়ছে। তারা এক এক সময় এক একটি গোষ্ঠীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে তাদের কখনও এসসি কখনও এসটি তালিকায় জায়গা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক একটি রাজনৈতিক দল এক একটি গোষ্ঠীর দাবিকে সমর্থন করে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে চায়। ফলে এক গোষ্ঠীকে যখন কোনও দল সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে উস্কানি দেয়, আর এক দল ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য গোষ্ঠীকে তার বিরোধিতায় নামাতে। যেমন এখন ধাঙড় বলে পরিচিত জনগোষ্ঠী আদিবাসী (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য কিছু গোষ্ঠী জোর প্রতিবাদ জানিয়েছে। এতে বিপাকে পড়ে কংগ্রেস তুলছে 'জাত গণনার' দাবি, ওবিসি-এসসি-এসটি তালিকার পরিসর বাড়ানোর দাবি। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সব কিছু ছেড়ে মহারাষ্ট্রে গিয়ে এই ওবিসি তাস নিয়েই হামলে পড়ছেন। এই ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জোরেই বিজেপি জোট সরকারের তত্ত্বাবধানে একের পর এক জাতভিত্তিক কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। এমনকি ব্রাহ্মণদের নামেও একটি এমন কর্পোরেশন হয়েছে। কিন্তু তাতে বিপদ বেড়েছে বই কমেনি, বিজেপি জোট সরকার কোনও গোষ্ঠীর জন্যই কর্মসংস্থান, বিশেষ সরকারি সুবিধা, উচ্চশিক্ষার সুযোগের অভাব, বাসস্থান, পানীয় জল ইত্যাদির সমস্যা মেটাতে পারেনি। হিন্দুত্ববাদের ছাতার তলায় এই সব গোষ্ঠীকে আনার কর্মসূচিতে নেতাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে সকলকে খুশি রাখার চেষ্টায়। সে জন্যই মহারাষ্ট্রে ভোট প্রচারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে সে রাজ্যের সমস্যা শিকেয় তুলে রেখে বলতে হচ্ছে কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা নিয়ে। বলতে হচ্ছে কংগ্রেস ওবিসিদের ভাগ করতে চাইছে, আমরা তাদের এক করব। বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ এবং জাতপাতের বিভেদ দুই পক্ষের কাছেই ভোটের হাতিয়ার। কিন্তু এ অনেকটা বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার মতো— উঠলে নামা মুশকিল, নামলেই সেই বাঘেই খাবে আরোহীকে।

কিন্তু পেট যে বড় বালাই— এ সত্য বড় নির্মম। তাই এখন সাধারণ মানুষকে কিছু সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যেন নিলামের খেলায় নেমেছে দুই পক্ষ। মহাবিকাশ আগাড়ির বিরুদ্ধে মহায়্যুতি জোটের অভিযোগ তারা ওদের কর্মসূচি চুরি করেছে! দুই পক্ষে লড়াই চলেছে 'লড়কি বহিন যোজনা' নিয়ে। মহায়্যুতি জোট সরকার পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র মতো 'লড়কি বহিন যোজনা'য় মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী তার পাল্টা বলে এসেছেন আমরা জিতলে মাসে তিন হাজার টাকা করে দেব।

মহায়্যুতি জোট বলেছে শিবাজির মূর্তি গড়ব, পাল্টা মহাবিকাশ আগাড়ি বলেছে আমরা সব জেলায় শিবাজির মূর্তি ও মন্দির করে দেব। এরা যেন জানেই না, এই মহারাষ্ট্রেই কৃষক আত্মহত্যা সারা ভারতে সর্বাধিক! মুম্বাইয়ের বস্তির মানুষের কষ্ট, বস্তিগুলোর জমি কর্পোরেট পুঁজির কবলে চলে যাওয়ার ফলে উচ্ছেদের সমস্যা, শহরে মাথা গোঁজার স্থান না পাওয়া মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের লোকাল ট্রেনের অসহনীয় ভিড়ের যাত্রা— এ সব কোনও কিছুই যেন ওরা কেউই জানে না! ওরা বোধহয় জানেই না, কী ভাবে খরায় ফুটিফাটা মাটির সামনে বসে মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অংশের কৃষকরা চোখের জল ফেলে প্রতি বছর। জানে না, মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অংশে সামান্য পানীয় জলের অভাবে মহিলাদের জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে! মানুষের জীবনের এমন সব জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর কোনও অস্তিত্বই নেই এই সমস্ত দলগুলোর ভোট প্রচারে। এ লড়াই যতই জমজমাট হোক, সাধারণ মানুষের জন্য তা পুরো অর্থহীন। পুরোটাই পরিচালিত জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার লক্ষ্যে।

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে এসইউসিআই(সি) প্রার্থী

নাগপুর পশ্চিম - কমরেড নর্মদা চারোতে

হিংনা - কমরেড মাধুরী নিকুরে ● দিনদোসি (মুম্বাই) - কমরেড দাত্তু গোবিন্দ কাজলে

মহিষমারি হাটে প্রতিবাদ সভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলপাখালিতে নয় বছরের নাবালিকার খুন ও ধর্ষণ এবং গঙ্গাধরপুরে মূক ও বধির মহিলার ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ৬ নভেম্বর কুলতলী বিধানসভার মহিষমারি হাটে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর আহ্বানে প্রতিবাদী হাটসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কুলতলীর প্রাক্তন বিধায়ক ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য জয়কৃষ্ণ হালদার দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর অঙ্গীকার নেওয়ার এবং জনস্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ ছাড়া বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য নিরঞ্জন নস্কর, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রকাশ মাইতি। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আনারুল ইসলাম।

ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা সম্মেলন এআইইউটিইউসি-র

৮ নভেম্বর এআইইউটিইউসি-র প্রথম ক্যানিং সাংগঠনিক জেলা সম্মেলন হয় ক্যানিং বন্ধুমহল ক্লাব হলে। মৎস্যজীবী, টোটোচালক, পরিযায়ী, নির্মাণ, বিড়ি শ্রমিক, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড ডে মিল, আশাকর্মী সহ তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রস্তাবের উপরে প্রতিনিধিদের বক্তব্যের পর আলোচনা করেন ইউনিয়নের রাজ্য সহ সভাপতি কমরেড নন্দ পাত্র, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জয়ন্ত সাহা প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রজাপতি খালুয়া। কমরেড বৈদ্যনাথ বরকে সম্পাদক ও কমরেড আমিরুল সরদারকে সভাপতি করে ৩৫ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 14 Bengali Weekly November 15, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

১৯১৭ সালের ৭-১৭ নভেম্বর বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল রাশিয়াতে। বিপ্লবের ১০৭তম বার্ষিকী দলের কেন্দ্রীয় দফতর সহ রাজ্যে রাজ্যে বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, ব্যাজ পরিধান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। কলকাতার এসপ্ল্যানেডে লেনিন মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এসইউসিআই(সি)-র পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ ও কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সংগঠকরা

‘প্রয়াসে’র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত

১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রেলকর্মীদের পত্রিকা ‘প্রয়াস’-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হল ১০ নভেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বরে।

বক্তব্য রাখেন রেল ধর্মঘট গবেষক অধ্যাপিকা ডঃ সংঘমিত্রা চৌধুরী ও অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলাল, রেল ইঞ্জিনিয়ার মিঠুন নাগ, অরিন্দম ভট্টাচার্য প্রমুখ। রেল শ্রমিক নেতা নিরঞ্জন মহাপাত্র রেলের বর্তমান দুর্দশার কথা তুলে ধরে তার অবসানে আপসহীন আন্দোলনের ডাক দেন। অবসরপ্রাপ্ত সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ার কালীশঙ্কর সামন্ত ক্রমবর্ধমান রেল দুর্ঘটনার কারণ, দুর্ঘটনা রোধে সরকারের উদাসীনতা, অবহেলা এবং সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে কাঁথিতে কনভেনশন

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে ২৭ অক্টোবর পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের প্রথম সারির সংগঠক আর জি কর হাসপাতালের ডাঃ সৌরভ রায়। নাগরিক সভায় নাগরিক সমাজের সর্বস্তরের দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক কিংশুক সাহা, ডাঃ সুনীত জানা, শিল্পী ও শিক্ষিকা সংঘমিত্রা পাল সিট এবং সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ রায়কে আহ্বায়ক করে ১৬ জন উপদেষ্টা সহ ১১৬ জনের নাগরিক মঞ্চ গঠিত হয়।

অভয়া স্মরণে ফুটবল প্রতিযোগিতা

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন রাজপথ ছাড়িয়ে এখন ময়দানে। পূর্ব মেদিনীপুর শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক ছাত্র যুব ফোরামের উদ্যোগে ১০ নভেম্বর ১২টি টিমের একদিনের অভয়া স্মৃতি মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন তমলুক মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাঃ শোভন হীরা। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন ডাঃ অসীম বেরা। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে অভয়াস্মৃতি ট্রফি তুলে দেওয়া হয়।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের রাজ্য সম্মেলন

প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই)-এর সপ্তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন ৯-১০ নভেম্বর মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরে সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় দু’হাজার প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও অতিথিদের উপস্থিতিতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের পর অভয়া, সমাজ ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রের পথিকৃৎ এবং যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত স্বাস্থ্যকর্মী ও সহ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তারপর মহান বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ সুপম মুখার্জী, পরিচালনা সমিতির সভাপতি ও বিধায়ক মহম্মদ আলি, উদ্বোধক ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, প্রধান অতিথি ডাঃ অশোক সামন্ত, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রমুখ।

স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রদর্শনীর পর মেডিক্যাল সায়েন্সের পথিকৃৎ মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করা হয়। বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, প্রিন্সিপাল ও কলেজ সভাপতি।

সম্মেলনে ডায়াবেটিস, হার্ট-এর সমস্যা, বেসিক লাইফ সাপোর্ট, অর্থোপেডিক সমস্যা ও তার প্রতিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ পার্থসারথী মণ্ডল, ডাঃ ইন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী, ডাঃ অশোক মজুমদার ও ডাঃ অনন্ত গর্গ। আর জি কর মেডিকেল কলেজের ছাত্রী অভয়ার বিচারের টালবাহানা এবং যুদ্ধবাজ মার্কিন ইজরায়েল জোট কর্তৃক গাজায় নৃশংস গণহত্যার প্রতিবাদে দুটি নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাংগঠনিক রিপোর্টের পর মূল প্রস্তাবে নন রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার্সদের বৈজ্ঞানিক সিলেবাসভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীর প্রশিক্ষণ ও শংসাপত্র দান, বিএমওএইচদের তত্ত্বাবধানে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে ব্যবহার, সকল আইএইচসিপিদের নাম নথিভুক্তিকরণ ও পুলিশ সহ ড্রাগ ইন্সপেক্টরদের দ্বারা হয়রানি ও জরিমানা বন্ধ করার দাবি তোলা হয়। অবিলম্বে এই স্বাস্থ্যকর্মীদের ওষুধ রাখা ও প্রেসক্রিপশন করার নির্দেশিকা প্রকাশ করারও দাবি জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের নেতৃত্ব ও পিএমপিএআই-এর উপদেষ্টা সহ সভাপতি ডাঃ কিসান প্রধান, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ ভবানীশঙ্কর দাস, সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ তরুণ মণ্ডলকে মুখ্য উপদেষ্টা, ডাঃ প্রাণতোষ মাইতিকে সভাপতি, ডাঃ রবিউল আলমকে সম্পাদক ও ডাঃ তিমিরকান্তি দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫১ জনের রাজ্য এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং ৭০ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ছাত্রস্বার্থবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে

এ আই ডি এস ও-র

দশম সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন

২৭-২৯ নভেম্বর • দিল্লি

উদ্বোধক ঃ ইরফান হাবিব, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ

প্রধান অতিথি ঃ অধ্যাপক চমনলাল, বিশিষ্ট লেখক

বিশেষ অতিথি ঃ অরুণ কুমার সিং, প্রাক্তন সভাপতি, এআইডিএসও

বক্তা ঃ ভি এন রাজশেখর, সভাপতি, এআইডিএসও

সভাপতি ঃ সৌরভ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, এআইডিএসও

সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তা ঃ প্রভাস ঘোষ

প্রথম সাধারণ সম্পাদক, এআইডিএসও, সাধারণ সম্পাদক এসইউসিআই(সি)

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com